বিজয়ে তাঁর নামখানি যদি .. ...

কাইউম পারভেজ

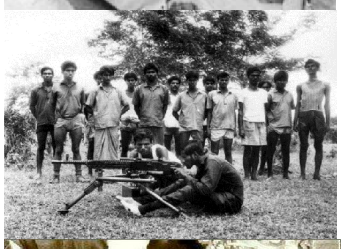

আজ ষোলই ডিসেম্বর। বিজয় দিবস। রাজীবের মন খুব খারাপ। এই প্রথম কোন বিজয় দিবস রাজীব ওর মা'র কাছে থাকতে পারলো না। হঠাৎ অফিসে জরুরী কাজ পড়ে যাওয়ায় রাজীব আটকে গেলো। অর্পিতাকে নিয়ে কাল সন্ধ্যায় প্রশান্ত পাড়ের এক বীচে গিয়ে সময় কাটিয়েছে। ষোলই ডিসেম্বর বিজয়ের দিন এলে রাজীব চেষ্টা করেও আনন্দিত হতে পারে না। ওর বাবার কথা মনে পড়ে। বাবার স্মৃতিটা ঝাপসা ছবিতে যা দেখে এখন সেটাই বাবার মুখ। চার বছর বয়সে বাবা চলে গেলেন মুক্তিযুদ্ধে। আর ফেরেননি। আজো জানে না রাজীব ওর বাবা জীবিত না মৃত! জানেনা ওর বাবার মৃত্যু হয়ে থাকলে তাঁর কবর হয়েছে কোথায়। আদৌ কবর হয়েছে কিনা তাও জানা নেই। মায়ের কাছে শুনেছে জুন জুলাই পর্য্যন্ত বাবার সাথে মায়ের যোগাযোগ হতো। মা যে স্কুলে চাকরী করতেন সে স্কুলের দপ্তরীর ছেলেও বাবার সাথে যুদ্ধে ছিলেন। সেই দপ্তরীর মাধ্যমে মা বাবার খোঁজ খবর পেতেন। রাজীবের বাবা মহসীন আলী ৮নং সেক্টরে যুদ্ধ করেছেন। একটা ব্যাংকে চাকরী করতেন। ছাত্র জীবনে রাজনীতির সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন তাই বঙ্গবন্ধুর সেই আহবান - তোমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকবিলা করতে হবে ... মনে রাখবা আমি যদি হুকুম দিবার না পারি .. ..শুনে বেরিয়ে গেলেন। মহসীন রাজীবের কথা ভাবলেন না। ভাবলেন না স্ত্রী রুম্পার কথা। জয় বাংলা বলে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

স্কুলের মাস্টারির আয় দিয়েই রুম্পা মানুষ করেছেন রাজীবকে। নিজের টিউশনীর পয়সা আর মায়ের সাহায্য দিয়ে রাজীব শেষ করেছে এমবিএ। এক সময়ে অর্পিতাকে নিয়ে মেলবোর্ণ চলে এসেছে। রুম্পাকেও নিয়ে এসেছিলো একবার। কিন্তু রুম্পা এক বছরের বেশী থাকতে পারেননি। রুম্পা দেশেই থাকতে চান। অদ্ভূত এক আশা - যদি কোনদিন মহসীন ফিরে এসে রুম্পাকে খোঁজে!

মাঝে মাঝে রাজীব ভাবে দেশের জন্য জীবন দিয়ে দিলো বাবা কিন্তু ওদের কী হলো। কী পেলো? অনেক চিন্তা করে দেখেছে সাভারের জাতীয় স্মৃতি সৌধ ছাড়া আর কিছু পায়নি। ওর মা পেয়েছে ওই সাভারের স্মৃতিসৌধ তাই প্রতি বছর ১৬ই ডিসেম্বরে ওখানে গিয়ে বসে থাকে। রুম্পার মনে হয় যদি কোনদিন ওই স্মৃতিসৌধের ভেতর থেকে হঠাৎ রাজীবের বাবা বেরিয়ে আসে! মাঝে রুম্পা ভাবে আচ্ছা ও যদি এরকম বেরিয়ে আসে তা'হলে আমি ওকে চিনতে পারবো তো? অবশ্যই পারবো ওর কপালে বাঁ দিকে একটা জন্মের দাগ আছে ওটাতো নিশ্চয়ই থাকবে।

দেশে থাকতে রাজীবও ওর মায়ের সাথে স্মৃতিসৌধে গিয়ে বসে থাকতো। যদিও একটা অবাস্তব বিষয় তবুও বাবার প্রতি মায়ের ভালবাসা দেখে রাজীব গর্বিত বোধ করে। ভাবে মা যদি এভাবে বসে থেকে শান্তি পায় সেটাই তো অনেক পাওয়া। স্মৃতিসৌধ থেকে ফেরার পথে রাস্তায় এদিক ওদিকে খালি তাকায় মা। রাজীব বোঝে মা বাবাকে খুঁজছে। স্মৃতিসৌধে গিয়ে রাজীব ভাবে আহা এখানে কোন জায়গায় কোনভাবে যদি বাবার নামটা লেখা থাকতো। তা'হলে ওর মা চোখের পানি দিয়ে ধূলো মাখা নামটা, মহসীন আলী নামটা ধুয়ে দিতে পারতো। রাজীব সেই নামের উপর একটা চুমু খেতে পারতো।

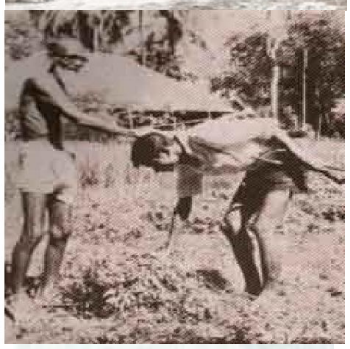

মেলবোর্ণে আসার পর সেবার ওরা প্রথম ক্যানবেরা বেড়াতে গিয়েছিল। রাজীব, মা আর অর্পিতা। ক্যানবেরার ওয়ার মেমোরিয়ালটা দেখতে গিয়ে ওরা সবাই কেমন যেন বিমর্ষ হয়ে গেল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ থেকে শুরু করে সকল যুদ্ধে অংশগ্রহনকারী সব যোদ্ধদের ইতিহাস নাম ঠিকানা (যতটুকু সংগ্রহ করা গেছে) রয়েছে যেখানে আত্মীয় স্বজন থেকে শুরু করে প্রজন্মরা বিশেষ বিশেষ দিনে যেমন এ্যানজাক ডে বা অস্ট্রেলিয়া ডে তে এসে নিহত স্বজনদের নামের পাশে ফুল রেখে যায়, আত্মার শান্তি কামনা করে। প্রতিদিন, রাতদিন স্থল নৌ বিমান সেনারা গার্ড অব অনার প্রদান করে। ওখানে যে কেউ গেলে তার মন নিহত সৈনিকদের জন্য অবনত হয়ে যাবে। চোখের কোনা ভিজে যাবেই।

তো সেদিন রাজীব আর রাজীবের মা বিমর্ষ হয়ে ভাবছিলেন এমনই একটা পরিবেশ যদি সাভার স্মৃতিসৌধে হতো। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের সব শহীদের নাম যদি ওই স্মৃতিসৌধের পাশ দিয়ে লেখা থাকতো! যদি এমনি করে সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যরা পালা করে প্রতিদিন ওখানে দাঁড়িয়ে থেকে এমন করে গার্ড অব অনার প্রদান করতো তবে রাজীবরা এবং রাজীবের মত আর যত শহীদ পরিবার আছে তাঁরা ওই নামের পাশে ফুল দিয়ে আত্মার মাগফিরাত কামনা করতে পারতো। সবার সামনে বুক ফুলিয়ে ওখানটায় যেতো। সবাই বুঝতো ওরা শহীদ পরিবারের একজন। ওদের সেই প্রিয়জনের আত্মাহুতির জন্য এদেশটা স্বাধীন হয়েছে। রাজীবের বাবার নামটা ওখানে লেখা থাকতো।

এই কথাগুলো আবার মনে হলো গতকাল বীচের ধারে এসে। অর্পিতাকে বললো জানো আমার ভীষণ গর্ব আমি মুক্তিযোদ্ধার ছেলে। কিন্তু কোথাও যদি সন্মানের সঙ্গে আমার বাবার নামটা লেখা থাকতো। আমরা কোনদিন দেশের কাছে আমাদের জন্য কোন সাহায্য বিশেষ করে আর্থিক সাহায্য চাইনি, নেইনি। শুধু চেয়েছিলাম আমার বাবার নামটা কোথাও একটু থাক।

জানো রাজীব আমার ভীষণ গর্ব আমি একজন শহীদ মুক্তিযোদ্ধার পুত্রবধূ। তোমার সাথে বিয়ে না হলে আমি এই দুর্লভ সন্মানটা কোথায় পেতাম? তুমি জানো না রাজীব আমি তোমাকে কতখানি ভালবাসি। আরে আমি না জানলে আর কে জানবে। শোন তুমি আমার বাবার জন্য গর্ব করার যে বিরল সুযোগ পাচ্ছ সে জন্য তো আমাকে তোমার রয়াল্টি দেয়া উচিৎ। ও তাই বুঝি? তো এতোদিন যা দিয়ে এলাম সেগুলো কী ফাও?

তারপর আবার অনেক্ষণ ওরা চুপ। মাঝে মাঝে অর্পিতা চেষ্টা করছে রাজীবের ভারাক্রান্ত মনটা হালকা করতে। রাজীব ভাল গান করে। অর্পিতা ভাবছে রাজীবকে এই সমুদ্রের পাড়ে একটা গান গাইতে বলবে কিনা। আবার ভাবছে তাতে রাজীব যদি বিরক্ত হয়! তবে অর্পিতা নিশ্চিত একটা গানের কথা বললেই ও গাইবে। তারপর একটু কাঁদবে যদিও। কিন্তু তাতে ওর মন অনেকটা হালকা হবে। অর্পিতা বললো - রাজীব তোমার সেই প্রিয় গানটা কী করবে? সমুদ্রের পাড়ে গানটা আমাদের দুজনারই এখন ভাল লাগবে। রাজীব বললো হুম সেটা গাওয়া যায়। গান ধরলো রাজীব .. ..

আমি এক মুক্তিযোদ্ধার ছেলে
সবার মুখে শুনি তাই
ইতিহাসের কোন পাতায় কোথাও
বাবার নাম লেখা নাই।।

পঁচিশে মার্চ্চ রাত্রে আমার বাবা গেল যুদ্ধেতে
আমার দিদামণি বসে কান্দে, জায়নামাজের শেষ প্রান্তে
আমার দাদুর ঘুম নাই আমার মায়ের কথা নাই
বাবা যদি আসে ফিরে তাই।

ষোলই ডিসেম্বরের শেষে মুক্তিযোদ্ধারা ফিরলো দেশে
আমার বাবা ফিরে এলো না, কেউ তার কোন খোঁজ দিলো না
আমার বাবার স্মৃতি নেই আমার মাও বেঁচে নেই
শান্তনা কোথা খুঁজে পাই?

রাজীব মাথার নিচে দু'হাত রেখে চিৎ হয়ে শুয়ে পড়লো। ওর চোখে বিস্তৃত আকাশ। যেন ওর সব কথা এবার আকাশ আর সমুদ্রের সাথে। আমার তো তবু মা আছে ওই ছেলেটার তো বাবাও নেই মাও নেই। ওর জন্য থাকুক জয় বাংলার দেশটার বুকে স্মৃতিসৌধটা যেখানে একদিন ওর বাবা আর আমার বাবার নামটা লেখা থাকবে।